বড়ুয়া জাতি

•—○○—•

পাক-প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক ময়নামতী পাহাড়ে বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপ খননকালে প্রাপ্ত প্রাচীন ধর্ম্মচক্র।

শ্রীউমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী,

সদ্ধর্ম্মপ্রবর্দ্ধক, তত্ত্বচিন্তামণি,

বিদ্যানিধি, সাহিত্যরত্ন

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ

২৫০২ বুদ্ধাব্দ

বড়ুয়া জাতি

জাতীয় ইতিহাস জাতির এক প্রধান সম্পদ, বড়ুয়া জাতির কোন লিখিত ইতিহাস নাই, কিন্তু জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, বা প্রবাদ-বাক্যাদি বিদ্যমান রহিয়াছে, এই সমুদয় সত্য হইতে বহু দূরে নয় যদি অবস্থাঘটিত প্রমাণ, সম্ভাবনা বা স্বতঃসিদ্ধ দ্বারা সমর্থিত হয়। সাক্ষ্য বিসয়ক আইনের ৩ ধারায় লিখিত আছে চাক্ষুসিক প্রমাণ অপেক্ষা অবস্থ ঘটিত ও সম্ভাবনা দ্বারা গৃহীত প্রমাণেরমূল্য সমাধিক; এখনও সকল সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরাগত প্রবাদ বাক্য ও প্রথাদি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। লেখা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পরবর্ত্তী মুখে মুখে শুনিয়া তাহা ধারণ করিত, নৈতিক চরিত্রবলের প্রভাবে তখন লোকের স্মৃতিশক্তি প্রবল ছিল। বেদ-বাক্য শুনিয়া শুনিয়াই ধারণ করিত বলিয়া বেদের অপর নাম শ্রুতি। বুদ্ধের সেবক ও নিত্যসহচর আনন্দ এবং বুদ্ধের অন্যান্য অর্হৎ শিষ্যগণ রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি যিনি যাহা বুদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলেন ৫০০ জন সদস্যদের মহাসভায় তাহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, এইরূপে বুদ্ধবাণী সংগ্রহ ও ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সংরক্ষিত করা হইয়াছিল, তৎপরে গুরুর মুখে শিষ্যক্রমে শুনিয়াই ধর্ম্ম ধারণ করা হইত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৭ অব্দে শ্রী লঙ্কায় মহাস্থবির রক্ষিতের সভাপতিত্বে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে ত্রিবিটক তালপত্রে খোদিত করা হয়। বড়ুয়া জাতি সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য কিংবদন্তী প্রভৃতির সত্যতার অনুসন্ধানের ফলে ও অবস্থাঘটিত প্রমাণ অবলম্বনে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মৎ-প্রণীত মাতৃ পূজায় মানব ধর্ম্মগ্রন্থে জাতীয় ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলাম, তাহা অবলম্বনে এই পুস্তিকা প্রণয়ন করিতেছি।

নালন্দাবিহার বিধ্বংস ও ভিক্ষুগণকে হত্যা করা হইলে মগধের (বিহারের) বৃজিজাতীয় এক রাজপুত্র তাঁহার ১০০ জ্ঞাতিগোত্র ও সৈন্যসহ দেশ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে চট্টগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, এই কিংবদন্তী বড়ুয়া সমাজের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি যে নালন্দা বিহার গোলাগুলি বর্ষণে ধ্বংস করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগে ইহার বিবরণ লিখিত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ মুসলমান লেখক মীন-হাজ উস-সিরাজী তাঁহার কৃত তবকৎ-ই-নাসীরী নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের ৫৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"Mahmmad Bakhtyar by the force of his intipridity threw himself into the postern of the gateway of the place and they captured the fortress and acquired great booty, the greater number of inhabitants of that place were Brahmans & the whole of the Brahmans had their head Shaven and they were all Slain. There were great number of books and when all these books came under observation of the Musalmans they Summoned a great number of Hindus that they might give them information respecting the import of these books but the whole of the Hindus had been killed. On becoming acquainted it was formed that the whole of the fortress and the city was a College and in the Hindi it tongue they call it College. Bihar.

"মহম্মদ বক্তিয়ার সেই স্থানের বহির্দ্ধারে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা দুর্গটী দখল করিলেন এবং বহু মূল্যবান সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানের বাসিন্দা অধিকাংশই মুণ্ডিতকেশ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সকলকে হত্যা করা হইয়াছিল। সেখানে বহু সংখ্যক পুস্তক পাওয়া গেল, পুস্তকের মর্ম্ম কি জানিবার জন্য অনেক হিন্দুকে ডাকিতে পাঠান হইল,

কিন্তু সমস্ত হিন্দুগণকে বধ করা হইয়া ছিল, পরে জানা গেল সমস্ত দুর্গ ও নগর কলেজ ছিল, হিন্দীভাষায় ইহাকে কলেজ বিহার বলা হইত।

এস্থলে ভিক্ষুগণকে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধগণকে হিন্দু, বিহারকে সৈন্যের দুর্গ এবং ভিক্ষুগণকে সৈন্য মনে করা হইয়াছিল, ইহাই ভাবার্থ। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬০০ ফিট দীর্ঘ ছয়তালা পাকা বিহারে ১৫০০প্রফেসার এবং১০০০০ ছাত্র বাস করতেন, নির্ব্বিচারে এত লোক হত্যার পর বিশেষতঃ সমগ্র নগরে একজন বৌদ্ধও পাওয়া না যাওয়ায় বৌদ্ধরা যে দেশ ত্যাগ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ।

চট্টগ্রামের বড়ুয়াগণকে রাজবংশী বলিয়া বলা হইত, (Hunter's Statistical Account of Bengal দ্রষ্টব্য ;) এখনও তাহারা রাজবংশ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। বিশ্বকোষ অভিধানে 'বড়ুয়া' সম্বন্ধে লিখিত আছে "একটী আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় বড়ুয়াগণ এক প্রতিভাবান বৌদ্ধ রাজবংশের বংশধর" সুতরাং কিংবদন্তীর মূলে সত্য নিহিত আছে। মগধদেশাগত বলিয়া বড়ুয়াগণ মগধ বা মগ নামে পরিচিত, হিন্দু মুসলমান বড়ুয়াগণকে মগ এবং বড়ুয়া পাড়াকে মগ পাড়া বলে। মগধ শব্দ হইতে অপভ্রংশে বা সংক্ষেপে মগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। মগধেরা বোকা লোককে 'অমগধ' বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। মগধগণ (বড়ুয়াগণ) তাহাদের পৈতৃক দেশমাতার স্মৃতিকল্পে ও সম্মানার্থ মগধেশ্বরীর পূজা করিতেন এবং সেই পুরাতন স্মৃতিকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের মধ্যে বড়ুয়াদের অনুকরণে হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই মগধেশ্বরীর সেবা করিতেন, তাহাতে পাটি বলি দিতেন, এখনও প্রায় প্রত্যেকগ্রামে মগধেশ্বরীর সেবাখোলা নির্দ্দিষ্ট আছে। ধর্ম্মসংস্কারের পর বৌদ্ধেরা পাঁটী বলি না দিয়া ফুল ও বাতি

দিয়া পূজা করিয়া থাকে। এক্ষণে ভূত-প্রেতাদির মন্ত্র-তন্ত্রেও ভুতের বৈদ্যগণ উন্মর্ত্ততা, ভয় ও ভূত-প্রেতাদির আবির্ভাব জনিত রোগে কাঁসা বাজাইয়া, মন্ত্রবলে **"আয়রে মা মগিনী মগধ রাজার ঝি"** ইত্যাদি গাহিয়া মগধেশ্বরীকে সাধনা করিলে রোগী বা মন্ত্রাহত ব্যক্তি (গাছা) ফুল হাতে নাচিতে২ অজ্ঞানবৎ হইয়া রোগের কারণ নির্ণয়পূর্ব্বক ঔষধ বলিয়া দেয় এবং অনেক সময় ঈপ্সিত ফল লাভ করে।

বিষুব সংক্রান্তির সময় পটীয়ার অন্তর্গত ঘহিরার ক্ষেত্রপাল মেলায় রোগ প্রতিকার ও কামনা পরিপূরণের জন্য হিন্দুদের মধ্যে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক উপরোক্তরূপে মগধেশ্বরীর সাধনা করিয়া থাকে। সেথানে বিনাওঝায় (ওস্তাদ ব্যতিরেকে) গাছারা (হিতপ্রার্থী বা তাহাদের পক্ষে অন্য কেহ) ফুল হাতে উপরোক্তরূপে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে আপনাআপনি নাচিতে নাচিতে রোগের কারণ নির্ণয় পূর্ব্বক ঔষধ বলিয়া দেয়, সাধারণতঃ বন্ধ্যা হইলে বা সন্তান না বাঁচিলে গর্ভবতী মেয়েরা এই পূজা মানসিক করিয়া থাকে এবং পাঁটি ব ল দিয়া পূজা করা হয়, এক্ষণে অনেক হিন্দু বিনা রক্তপাতে প্রাণীযজ্ঞাদি সম্পাদন করে, পাঁটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বধ না করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেওয়াই প্রশস্ত, জীবন দানের জন্য জীবনপাত উচিত নহে, প্রাণী হত্যা মহাপাপ।

বড়ুয়াগণের পূর্ব্ব পুরুশেরা যে মগধ হইতে এদেশ আসিয়াছিলেন এই সমুদয় তাহার অকাট্য প্রমাণ। সাহিত্যসেবী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮১৫ শকে চৈত্র সংখ্যায় লিখেন "দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধেরা নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ করিয়া স্বদেশ (মগধ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এতদ্বারা কথিত জনশ্রুতি সমর্থিত হইতেছে। চট্টগ্রামে

সপ্তম খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই জন্য মাগধীগণ চট্টগ্রামেই চলিয়া আসিয়া ছিলেন, ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীকৃত চট্টগ্রামের ইতিহাসের ১৩ পৃষ্টায় লিখিত আছে—খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মগধ দেশ হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারকগণ পূর্ব্বদেশে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেণ। চীনপরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ৬২৯—৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পাক-ভারত পরিদর্শন করেন। তিনি সমতটে ও শ্রী চটলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সমতটে দুই সহস্র বৌদ্ধযাজক পূর্ণ ত্রিশ সংখ্যক সঙ্ঘারাম দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়ছেন। বাখরগঞ্জ জিলার উত্তরাংশে (দক্ষিণাংশ তখন সমুদ্রগর্ভে) নোয়াখালীর কতকাংশ অবশিষ্ট পারে ভরট হইয়াছে) ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জিলার সমুদ্র তটের নিকটবর্ত্তী স্থান সমুহ সমতট বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। চট্টগ্রামের বিবরণীতে সতীশচন্দ্র ঘোষও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। হুয়েন সাঙ আপন ভ্রমণ বৃত্তান্তে শ্রীচটল সমতটের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বহু সংখ্যক চৈত্যবিশিষ্ট পার্ব্বত্যস্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রী চটল চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম বলিয়া পূর্ণবাবুও তাহার ইতিহাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমতটের রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন (Chavane's memoire ১২৮ | ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পাক্ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডক্টার এফ, এ, খান কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ময়নামতী পাহাড় খননপূর্ব্বক এক বৃহৎ সঙ্ঘারাম অবিস্কার করিয়াছেন, এবং ১৯টী কামরার ভগ্নাবশেষ উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মচক্র, লিপিখোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি আরও বহুমূল্যবান দ্রব্য প্রাপ্তির ফলে এদেশে যে ভিন্ন ২ বৌদ্ধরাজা রাজত্ব করিতেন তিনি তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, (পাল রাজারা উত্তর বঙ্গ শাসন করিতেন।)

এতদ্দারা প্রমাণিত হয় যে মুসল-রাজত্বের বহু পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধেরা বাস করিতেন। হাইকোর্টের জজ সারদা চরণ মিত্র জগজ্যোতি, পত্রিকার একাদশ সংখ্যায় লিখিয়াছেন মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙ্গালী বৌদ্ধেরসংখ্যা নিতান্ত অল্পছিলন।। সপ্তমখৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারও চক্রশালা বৌদ্ধজগতে এত প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল যে সুদূরবর্ত্তী তিব্বত হইতেও বহু শিশিক্ষু এখানে আসিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিতেন। পণ্ডিত বিহারের অবস্থিতি এখনও নির্ণীত হয় নাই, বঙ্গসাগরের তীরবর্ত্তী দেয়াঙ এর পাহাড়ে অনেকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যাওয়ায় ডক্টার বড়ুয়া সেই স্থান পরিদর্শন করেন, কিন্তু তাহতে পণ্ডিতবিহার ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। পটীয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হাইদগাও গ্রামে চক্রশালায় এক প্রাচীন বৌদ্ধ চৈত্য * আছে, আর, এস, সরিপে ঐ স্থানই চক্রশালা এবং বৌদ্ধদের ব্যবহার্য্য বলিয়া লিখিত আছে। বৌদ্ধ সমাজের উজ্জল জ্যোতিষ্ক আচারিয়া চন্দ্রমোহন মহাস্তবির চৈত্যটীর সংস্কার করেন, বহুকাল হইতে বিষুব সংক্রান্তির সময় সেখানে বৌদ্ধদের এক মেলা বসে, স্বনামখ্যাত উকিল অন্নদাচরণ

* চট্টগ্রামের আশে পাশে অনেক স্তুপ বা চৈত্যাছিল, তাই চৈত্য-গ্রাম পরে চট্টগ্রাম নামকরণ করা হয়। কালের কুটিল গতিতে সেই গুলি ভুগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রংমহল পাহাড় খনন কালে যে বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা চট্টগ্রাম বিহার পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছে। হিঙ্গুলী, ভাটিয়ারী ও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি চট্টগ্রাম বিহারে, কয়েকটি পাহাড়তলী মহানন্দ বিহারে সংরক্ষিত আছে। বেতাগী পাহাড়ের নীচে আর একটি স্তুপের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

দত্তের পর তৎ ভ্রাতা রায়বাহাদুর জ্ঞানদা রঞ্জন দত্ত যাত্রীদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যাপক প্রজ্ঞা-ভদ্র চক্রশালায় বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, বিক্রমপুরের বজ্র যোগিনী গ্রামের বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান (অতীশ) চক্রশালায় আসিয়া প্রজ্ঞা ভদ্রের নিকট শিক্ষালাভার্থ আগমণ করেন। পরে তিব্বত রাজের অনুরোধে তথায় যাইয়া ধর্ম্মসংস্কার ও মহাযানী ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিব্বত বাসীরা দেবতাজ্ঞানে এখন ও তাঁহার স্মৃতিপূজা করেন (তাঞ্জোর দ্রষ্টব্য।) বড়ুয়াদের পূর্ব্ব পুরুষগণ স্বধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধগণের সহিত নিরাপদ অবস্থানের জন্য বৌদ্ধদেশ আরাকানের সন্নিহিত চট্টগ্রামে চলিয়া আসেন, ইহাই যৌক্তিক, যেমন ভারত হইতে বহু মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা আসাম হইয়া চট্টগ্রামে চলিয়া আসেন, যাঁহারা আসামে ছিলেন (বড়ুয়া উপাধী ধারী বহু লোক) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জাগরণে হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদ্বিষয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

মগদের অন্তর্গত বৈশালীর ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বৃজিরাজবংশীয় ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় বৌদ্ধমহাসঙ্গীতিতে নির্দ্ধারিত বিনয়ের কয়েকটী কঠোর নিয়ম উপেক্ষা করিয়া তাহাতে দশ সংযোজন (দস বত্থুনি) প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা বলেন ঐগুলি বুদ্ধের মুখনিঃসৃতবাণী নহে। দশ সহস্র প্রতিপক্ষীয় ভিক্ষু ভিন্নসভায় তাহা সমর্থন করেন। সেই হইতে তাঁহারা বজ্জিপুত্তকমতাবলম্বী ভিক্ষু (মহাসঙ্ঘিকা) নামে পরিচিত হন। সেই বজ্জিপুত্তকমতাবলম্বী বৌদ্ধগণ চট্টগ্রামে আগমন করায় বজ্জি শব্দ হইতে বড়ুয়া শব্দ হইয়াছে বলিয়া ডক্টার বড়ুয়া প্রভৃতির মত। মগধের বৃজি জাতি তত্রত্য অভিজাত রাজ বংশের বংশধর, তদ্ধেতু শ্রেষ্টার্থে বজ্জি শব্দের অপভ্রংশে বড়ুয়া শব্দ হওয়া স্বাভাবিক।

সংস্কৃত 'বটুক' শব্দের অর্থ শ্রমণ বা শ্রেষ্ঠ, মাগধী ভাষায় অকারন্ত শব্দ আকারান্ত উচ্চারিত হয়, তদ্ধেতু বটুক (বটুক্কা) শব্দের অপভ্রংশে বড়ুয়া শব্দ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসও তাঁহার পদাবলীতে শ্রেষ্টার্থে বড়ুয়া শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বড়ুয়াদের মধ্যে পুত্রবধু শ্বশুরকে সম্মানার্থ বড়ুয়া আহ্বান করেন। বড়+অরিয়, অরিয় পালি শব্দ, অর্থ আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং বড়ুয়া শব্দ শ্রেষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরাকানের বৌদ্ধগণ আপনাদিগকে রাক্ষাইংচা বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা মগধ দেশাগত বা মগ নহেন, চট্টগ্রামের বড়ুয়াগণকে তাঁহারা মার্ম্মাগ্রী বলেন (কর্নেল ফেয়ার সাহেবের আরাকানের ইতিহাস রাজবংশ দ্রষ্টব্য) ব্রাহ্মণগণকে শর্ম্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণকে বর্ম্মণ, বর্ম্ম বা শস্ত্রধারী যোদ্ধা বলা হয়, বর্ম্ম শব্দ ব্রহ্ম ভাষায় ম্রামা, গ্রী শব্দের অর্থ Great, বড় বা শ্রেষ্ঠ, তদ্ধেতু মার্ম্মাগ্রী বা ম্রামাগ্রী শব্দে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বা শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বুঝায়। মগধের বৃজি জাতীয় লোক যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা মহাবংশ নামে বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে। বড়ুয়াগণ প্রাচীন কাল হইতে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। বড়ুয়া ও মার্ম্মাগ্রী শব্দদ্বয় একার্থবোধক। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ বড়ুয়াগণের চট্টগ্রামে আগমণ করার প্রায় ২৬০ বৎসর পরে আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা চট্টগ্রাম শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তৎপরেই রাক্ষাইং-চাগণ ক্রমে চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সেন্সস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাণ্টার সাহেবের Hunter's Statistical account of Bengalএ লিখিত বড়ুয়াগণের আরাকানজাতি হইতে উৎপন্ন হওয়ার (পিতা বাঙ্গালী, মাতা আরাকানিজ অর্থাৎ শঙ্কর জাতি হওয়ার) উক্তি সর্ব্বৈব অমূলক ও ভিত্তিহীন। আরাকান জাতি হইতে উৎপন্ন হইলে আরাকানবাসী বৌদ্ধগণ কখনও বড়ুয়া-

গণকে ব্রামাগ্রী এই সম্মানসূচক আখ্যা প্রদান করিতেন না। হান্টার সাহেব কোন দলিল বা প্রমাণের উপর ভিত্তি না করিয়া একটা জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ভ্রান্ত সংবাদের উপর অথবা উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঘোর অবিমৃষ্যকারিতা ও অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। আমার পাঠ্যাবস্থায় শুনিয়াছিলাম চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির পক্ষে স্বর্গগত ভগীরথ ডাক্তার, ঈশান বাবু প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয় আপত্তি দিয়াছিলেন, ফল কি হইয়াছিল জানি না। কিন্তু প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে পাক গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত পাকিস্তানী খবর পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বড়ুয়া জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক হান্টার সাহেবের অনুরূপ শঙ্কর জাতি (পাহাড়ী আরাকানী ও বাঙ্গালী (মিশ্রিত) বলিয়া প্রচারিত করায় পাহাড়তলীর শ্রীমান নিরঞ্জন বড়ুয়া আমার নিকট প্রতিবাদ দেওয়ার জন্য আসিলে আমি মাতৃপূজায়মানবধর্ম্ম হইতে এ বিষয় উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য সহ প্রতিবাদ পাঠাইলে ঐ পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহা প্রচারিত হইয়াছিল। আরাকানবাসী বৌদ্ধগণকে মগ বলা যে ভ্রান্তধারণার মূল হান্টার সাহেবের উক্তি তাহারই ফল। মুসলমানেরা সিন্ধুনদীর এ পাড়ের সকল ভারতীয়গণকে হিন্দু বলিতেন, সেই হিসাবে মুসলমানগণ আরাকানিজ ও বাঙ্গালী বৌদ্ধ উভয়কেই মগ বলিতেন।

১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্বে আরাকানের রাজা মিনখাই চট্টগ্রামের কতেকাংশ জয় করেন, তৎপুত্র বাচপিউ ঐ সনে সমগ্র চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, মংফুলা নামে আরাকানের পরাক্রান্ত রাজা ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা, আসামের কিয়দংশ ও ঢাকার কতেকাংশ জয় করিয়া মেঘনার পাড়স্থ যুগদিয়া দুর্গ সুরক্ষিত করেন। আরাকানরাজ এই ভাবে ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সমুদয় স্থানে রাজত্ব করেন, তখন বড়ুয়াগণ সর্ব্বে সর্ব্বা

ছিলেন এবং আরাকান রাজের সামন্ত নৃপতিরূপে এদেশ শাসন করিতেন। এই সময়ে পর্তুগীজ বণিকেরা চট্টগ্রামে এবং পাকভারতের অন্যান্য বন্দরে বাণিজ্য করিতেন, তাহাদের অনেকেই এখানে বসতি-স্থাপন করে, (তাহাদের মেটে ফিরিঙ্গী বলা হয়)। তাহারা নৌবিদ্যাবিশারদ বলিয়া আরাকানরাজ তাহাদের দলে দলে নৌসৈন্যে ভর্ত্তি করেন। লুণ্ঠতরাজ পর্তুগীজগণ বঙ্গদেশের স্থানে ২ নদীতীরের গ্রামসমূহে লুঠপাট করিয়া দেশে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল। আতঙ্কগ্রস্ত দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খান ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ দস্যুদমন ও চট্টগ্রামাদি দখল করার জন্য তিন সহস্র সৈন্য লইয়া হোসেনবেগকে জলপথে এবং দশ সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া স্বীয় পুত্র বুজরুগ উমেদ-খানকে স্থলপথে প্রেরণ করেন। আরাকানরাজের পদাতিক ও অশ্বা-রোহী সৈন্য ব্যতীত তিন শত রণতরী ছিল, কিন্তু নৌসৈন্যর মধ্যে পর্তুগীজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে কৌশলে স্বপক্ষে নিয়া আসিলেন, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আরাকান রাজের অপর সৈনেরা পরাজিত হইল, নবাবের সৈন্য যুগদিয়া হইতে সন্দীপ, এদিকে আন্দরকিল্লাদি দখল করিল, (H.S.A.B. ৬ নং ভলুম দ্রষ্টব্য)। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমান বিজয়ের পর অধিকাংশ আরকানিজ স্বদেশে চলিয়া গেলেন। যাহারা রহিলেন তাহাদের বংশধরগণ কক্সবাজার অঞ্চলে ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বসতি করিতেছেন। বড়ুয়াগণও অনেকে চট্টগ্রামের প্রান্তভাগে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন, কিন্তু সম্পত্তি, জমি জমা সবই হারাইলেন : "পুকুর পারে, বন-জঙ্গলে শুইব, তবুও কর দিব না" "এই দুর্জ্জয় অভিমানে মন্ত্রাহত রুদ্ধবীর্য্য ফণীর ন্যায় আপনার মনে আপনি গুমরিতে লাগিলেন। মগধরাজবংশধরগণের এবংবিধ

প্রতিযোগীতা ক্ষাত্রবীর্য্যের অনুরূপ হইলেও সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে, গৌরবের হইলেও প্রার্থনীয় নহে, আত্মপ্রভুত্ব স্থাপনের প্রতিকুল কারণ উপস্থিত হইলেই তাঁহারা বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অনু-কুল স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, এইরূপে ভ্রমণপরায়ণ মগধগণ নিয়ত বাসস্থান পরিবর্ত্তন হেতু হৃশ্বতেজ ও হৃতধন হইতে লাগিলেন, বহুকাল পরে সুবুদ্ধির উদয় হইল, কিন্তু অনেকে বহু ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও নিঃস্ব হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। আর যাঁহারা দেশত্যাগ করেন নাই, তাঁদের মধ্যে বৃহৎ ক্যজহোয়াসাং তরফের মালিক উইনাইন পুরা ও পাঁচরিয়ার চৌধুরীগণ, তালসরার একবৃহৎ তরফের মালিক মচ্ছন্দীগণ এবং অন্যান্য বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন।

এইরূপে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে সরল ও শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধগণ ভুলিলেন ধর্ম্ম, ভুলিলেন শিক্ষা, রহিলমাত্র রুদ্ধ ক্ষাত্রবীর্য্য, কিন্তু দুইশত বৎসরের উর্দ্ধকাল আরাকানিজ ও বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের একত্রবাসহেতু তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মীয় প্রভাব—নামকরণ ইত্যাদি বড়ুয়া সমাজে কিছু কিছু সংক্রামিত হইলেও বড়ুয়া জাতি তাহাদের পুরুষ পরাম্পরাগত ভাষা, বাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, দায়ভাগমতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব মৃতদেহ সৎকার, পিণ্ডদান প্রথাদিতে আরাকান-বাসী বৌদ্ধগণ হইতে আবার যাগযজ্ঞক্রিয়াশীল হিন্দু হইতেও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এখনও কক্সবাজার অঞ্চলে উভয় সম্প্রদায় একই গ্রামে পাশাপাশি বাস করিলেও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাও হান্টার সাহেবের মতের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ।

চট্টগ্রামে মাগধী প্রাকৃত ভাষাই তখনকার কথা ভাষা ছিল। মুসলমান রাজত্বের সময় হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারী ও অন্যান্য

উপনিবেশিকস্বরূপ এদেশে আগমন করায় ইহার সহিত বাঙ্গালা, পারসী, উর্দ্দু ভাষা সংমিশ্রিত হইয়া আমাদের অপরূপ চট্টগ্রামী ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে। "অথস্ম মংসং খাদন্তস্ম অট্টি গলে লগ্গি" এই মাগধী বাক্যের চট্টগ্রামের কথিত ভাষায় অনুবাদ এই—"মাংস খাইতে খাইতে হাড্ডি গলায় লাইগ্যে"। মাগধী 'বসত' 'খাদত' শব্দের চট্টগ্রামী ভাষায় 'বস্তক'; 'খাতক'। আস্তক্, বস্তক্, খাত্তক্, করত্তক্ ইত্যাদি শব্দ অন্য কোন জিলায় শুনা যায় না। বড়ুয়াগণের মগধ হইতে এখানে আসিবার ইহাও অবস্থাঘটিত প্রমাণ।

সপ্তম খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার ভিক্ষুগণ মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন, নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। ব্রহ্ম ও আরাকানের ভিক্ষুগণ স্থবিরবাদীছিলেন। আরাকানরাজের দুইশতাধিক বৎসর চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা শাসনকালে আরাকানের হীনযানী ভিক্ষুগণের সংস্রবে আসিয়া এদেশের ভিক্ষুগণ স্থবিরবাদ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে বৌদ্ধগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায় সদ্ধর্ম্ম ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া রহিল, ফুঙ্গীরা রাওলীর হলুদাবস্ত্রই ধর্ম্মের বহিরাবরণ হইয়া পড়িল। প্রায় দুইশত বৎসর অতীত হইল চকরিয়া নিবাসী চেন্দী বড়ুয়ার পুত্র কেয়কচু সরভু সহাস্থবির কর্ত্তৃক উপসম্পদা গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রজ্যোতিঃ নামধারণ করেন এবং বিশ বৎসরকাল মৌলমেনে হীনযান ধর্ম্মবিনয় অধ্যয়ন পূর্ব্বক তদ্দেশীয় দশজন ভিক্ষুসহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে আগরতলীর রাজবংশীয় বলিভীম আদিত্য সেখানে তাঁহার জন্য বিহার নির্ম্মাণ করেন, তিনি সেখানে পাঁচ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করেন ও এক ভিক্ষুসীমা (চিং) প্রস্তুত করেন। ঐ সীমায় ক্রমে প্রায় ১০০ জনকে ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সীতাকুণ্ড পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে

এক আশ্রম নির্ম্মাণ করেন সেই হইতে চন্দ্রজ্যোতিঃ ভিক্ষুর আশ্রমের নামানুসারে ঐ সীতাকুণ্ড পাহাড় চন্দ্রনাথ নামে পরিচিত হয়, সেখানে জনৈক পাহাড়ী মুরুং একটি বুদ্ধচৈত্য স্থাপন করেন, তাহাতে পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের নিদর্শন ছিলনা, পরেই সেখানে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, যেমন রাজগৃহে, সারনাথে, বুদ্ধগয়ার মন্দির পার্শ্বে পরে শিব ও জৈন মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইলে সীতাকুণ্ডকে অন্যান্য বহু বৌদ্ধতীর্থের ন্যায় হিন্দুতীর্থে পরিণত করা হইয়াছে, ভিক্ষুচন্দ্রজ্যোতিঃ চকরিয়া ও চক্রশালা পরিদর্শন করেন, ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্ত্তি ঠেগরপুনি গ্রামে স্থবিরের পিতৃব্য রাজমঙ্গল মহাস্থবিরের বিহারপার্শ্বে কাঠের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই কাঠের ঘর ভগ্নদশায় পতিত হইলে মূর্ত্তিটা অদৃশ্য হইয়া গেলে বহু বৎসর পরে বাকখালীর শ্রীধন বড়ুয়ার স্ত্রী নীলকুমারী বড়ুয়া স্বপ্নাদেশে মূর্ত্তিটার দুই খণ্ড উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, ৩য় খণ্ড পাওয়া গেলনা, আরাধন মহাস্থবির এই দ্বিভঙ্গ মূর্ত্তি ঠেগরপুনিতে মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, এই বুদ্ধমূর্ত্তিই বুড়া গোসাই নামে সুপ্রসিদ্ধ।

[এই কাহিনীটি সদ্ধর্ম্মরত্নাকর হইতে গৃহীত]

পাহাড়তলীর অমর চাইঙ্গ ঠাকুর আরাকানের মহামুনি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার এক চিত্র অঙ্কিত করিয়া আনেন এবং গ্রামবাসীর চাঁদায় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আকিয়াবের শিল্পীদ্বারা মহামুনি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া বংশনির্ম্মিত ছাদযুক্ত গৃহে রক্ষা করেন। মংরাজার পূর্ব্ববর্ত্তী ধার্ম্মিকপ্রবর কৃষ্ণ ধামাই একচূড়াযুক্ত পাকামন্দির এবং মহানন্দবিহার নির্ম্মান এবং মন্দির হইতে এক তৃতীয়াংশ মাইল দূরে পাহাড়ের মধ্যে এক ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠিত করেন, চৈত্রসংক্রান্তি দিবসে চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান ভিক্ষু ও শ্বহীকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক

বিনয়ানুযায়ী মন্দির ও বিহার ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট উৎসর্গ করেন। সেই উপলক্ষে অসংখ্য লোকসমাগম হয়, সেই হইতে প্রতিবৎসর বিষুবসংক্রান্তির সময় মেলা বসে এবং মেলার ক্রমোন্নতি হওয়ায় ধামাই মহাশয় তীর্থযাত্রীর সুবিধার জন্য নিকটে ধামাই দিঘী নামক একটি বৃহৎ দিঘী খনন করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ক্যজচাই মানরাজা মন্দিরের চূড়াটি ভাঙ্গিয়া সাবেক মন্দিরের চারিদিকে প্রশস্ত ২য় দেওয়াল ও পঞ্চচূড়াযুক্ত সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মহামুনি মন্দির ও মহামুনি মেলার খ্যাতি সমগ্র বৌদ্ধজগতে ছড়াইয়া পড়ে। স্বনামখ্যাত কর্ণেল অলকট, জাপানের ডক্টার আর-কিমুরা, বৌদ্ধ জগতের উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক ধর্ম্মপাল, ইটালী দেশের স্বনামধন্য ভিক্ষু লোকনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষগণ মহামুনি মেলায় আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন, এই মেলা ও মন্দির সমগ্র জাতির গৌরবের বস্তু এতদ্বারা বড়ুয়া জাতির সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, পাহাড়তলীর উন্নতির মূলে মহামুনি মন্দির ও মহামুনি মেলা।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য চাকমারাণী কালিন্দীরাণী রাজানগরে অনুরূপ বুদ্ধমন্দির (শাক্যমুনি মন্দির) নির্ম্মাণ ও শাক্যমুনি মেলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাণী মহোদয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজগুরু মাণিক্য মহাস্থবির, রাম দাশ মহাস্থবির, ত্রিরতন মহাস্থবির, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রথম সভাপতি "বিনয় ও অভিধর্ম্ম শাস্ত্রবিদ্" হারবাং বিহারের স্বনাম খ্যাত আরকানিজ ভিক্ষু গুণমেজু মহাস্থবিরের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশ হইতে তাঁহার গুরু এবং আরো কয়েকজন ভিক্ষু আনাইয়া শাক্যমুনি মন্দিরের নিকট 'স্থলকুল বদ্ধ ক্ষুর চিং' (ভিক্ষুষীমা) স্থাপন করাইয়াছিলেন এবং তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নয়াপাড়ার ফুল লোথকের দ্বারা বার্ম্মিজ-ভাষায় লিখিত থাদুত্তোয়াং নামক পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া বৌদ্ধরঞ্জিকা নাম দিয়া বুদ্ধের জীবনী প্রকাশিত করেন, ইহাই

সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ। বৌদ্ধরত্ন হরগোবিন্দ মুচ্ছুদ্দী ও গোবিন্দ পণ্ডিত দ্বারা প্রণীত প্রেতবস্তুর অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় ২য় বৌদ্ধ গ্রন্থ। এই ভাবে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে বৌদ্ধজাতির মধ্যে ধর্ম্মের জাগরণ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ বার্ম্মীজ ভাষা শিক্ষা করিয়া বার্ম্মিজ অক্ষরেলিখিত পালিগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। মহাস্থবির মানিক্য, রাধাচরণ, তিত্তন, রামদাশ প্রভৃতি বার্ম্মীজ ভাষায় ও পালিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু সমাজে বহু অবৌদ্ধোচিত প্রথা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, ভিক্ষুদের মধ্যে নিমন্ত্রনে মাৎবরি করা, পূর্ব্বতন বজ্জিপুত্তকমতাবলম্বী ভিক্ষুর ন্যায় খাদ্যাদি সম্বন্ধে বিনয়ের নিয়ম শিথিল করা প্রভৃতি কারণে সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য একজন বিনয় বিশারদ ও শক্তিশালী ভিক্ষুর আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল; তাই দূরদর্শী রাধাচরণ মহাস্থবির ১৮৬৪খৃষ্টাব্দে আকিয়াবের সঙ্ঘরাজ সারমিত্রকে চট্টগ্রামে লইয়া আসেন। তিনি পাহাড়তলী গ্রামে একবৎসর থাকিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্রে সমাজে নবজীবন সঞ্চার করেন, বহুকুসংস্কার ও কুপ্রথা দূরীভুত হইতে চলিল। উপরোক্ত সঙ্ঘনেতাত্রয়—রাধাচরণ রামদাশ ও তিত্তনমহাস্থবির সঙ্ঘরাজের সহিত প্রত্যক্ষ যোগদান না করিলেও তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা ছিলনা ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রতিযোগিতাই ছিল।

ইংরেজরাজত্বের প্রারম্ভে বড়ুয়াগণ ক্ষাত্রবীর্য্যের প্রভাবে দলে দলে মিলিটারী বিভাগে ভর্ত্তি হইতে লাগিলেন। ক্রমে গভর্ণমেণ্ট মগপল্টন (Platoon) সৃষ্টি করিলেন। আমার পিতার প্রপিতামহ মগসুন্দর মুচ্ছুদ্দী, ঠেগরপুনির নাইচাং তাহাতে এড্‌জুটেণ্ট (প্রকাশ আজীটং) ছিলেন। মগপল্টন ও নেজাম পল্টনভুক্ত বহু বড়ুয়া আফগান যুদ্ধ, ব্রহ্ম যুদ্ধ, শিখযুদ্ধ ও চিনিয়ালওয়ালা যুদ্ধে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অনেকেই জমাদার, সুবাদার, সুবেদার মেজর,

হাভিলদার (পাহাড়তলীর নারায়নসিং সুবাদার, কালাচান সুবেদার, জ্যেষ্টপুরার দীপচান সুবেদার, আব্দারমানিকের জয়সিং সুবেদার, বাঘখালীর উদয়চান জমাদার বাহাদুর, বীনাজুরীর লক্ষণসিং জমাদার প্রভৃতি) উচ্চসৈনিক পদে উন্নীত হন। পাহাড়তলীর মোহন সিং সুবেদার বাহাদুর যুদ্ধে কৃতিত্বের ফলে এক মূল্যবান মেডেল (তকমা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহামুনি মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে তিনি এক ক্ষুদ্র মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। দেশে শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইলে সরকার মগপল্টন উঠাইয়াদেন (disbanded.) বড়ুয়াগণকে তখন দলে দলে পুলিশ বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়, চট্টগ্রামে বড়ুয়াকনেষ্টবলের সংখ্যা তখন শতকরা ৭০ জনেরও অধিক ছিল। গভর্নমেন্ট বড়ুয়াদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেন, রাউজানের রাজপ্রতাপ ডাক্তার আবুরখিলের রামচন্দ্র ডাক্তার, আরো অনেক বৌদ্ধছাত্রকে কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে বিশেষ বৃত্তি দিয়াছিলেন, পুস্তক খরিদেরজন্য নগদ টাকাও দিয়াছেন, ফলে চট্টগ্রামে বড়ুয়া ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বৌদ্ধসমাজের স্বনামধন্য নেতা কৃষ্ণনাজির ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বৌদ্ধসমিতি স্থাপন করেন, তিনি সম্পাদক এবং হারবাং বিহারের তেজস্বী আরকানিজ ভিক্ষু গুণমেজু মহাস্থবির সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন, বিদ্যাবিনোদ কালিকিঙ্কর মুচ্ছদ্দীর সম্পাদকতায় সমিতি মাসিক পত্রিকা বৌদ্ধবন্ধু প্রকাশ করিয়া সমাজের অভাব অভিযোগ সরকারের গোচরীভূত করিতে ও সমাজের জ্ঞানবিস্তার করিতে লাগিলেন। নাজির বাবু সমাজের উন্নতির কার্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবার জন্য সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করিলেন ও গ্রামে গ্রামে যাইয়া বিদ্যা ও ধনের উন্নিতর জন্য গ্রামবাসিগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে তিনি রেঙ্গুনে ব্যবসা আরম্ভ করিলেন।

ও বৌদ্ধরত্ন হরগোবিন্দ মুচ্ছদ্দীর চেষ্টায় চট্টগ্রামের তিনটি মডেল স্কুলের মধ্যে পাহাড়তলী ও সাতবাড়িয়া গ্রামে দুইটী মডেল স্কুল স্থাপিত হইল, জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নাজির বাবু ধার্ম্মিকপ্রবর পণ্ডিত ধর্ম্মরাজ বড়ুয়াকে উচ্চ পালিশিক্ষার জন্য শ্যামদেশে প্রেরণ করেন। তিনি পাঁচবৎসর ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যে সূত্রনিপাত, দানশীলভাবনা সম্বন্ধে এবং অত্যাবশ্যকীয় সূত্রাদির পদ্যে ও গদ্যে ধর্ম্মসার নামে বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পুস্তকাদি পাঠে আমার ধারণা জন্মিয়াছে আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন বৌদ্ধ পালিশাস্ত্রজ্ঞানে ও বাঙ্গালা পদ্যে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, [মোক্তার তেজস্বী সর্ব্বানন্দ বাবু কর্ত্তৃক রচিত Arnold সাহেবের Light of Asia এর জগজ্জ্যোতিঃ নাম দিয়া বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া কবি নবীনসেন, ডক্টার বড়ুয়া প্রভৃতি তাঁহার উচ্চ কবিত্ব শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন, কিন্তু পাণ্ডুলিপি খানি আজপর্য্যন্ত মুদ্রাযন্ত্র দর্শন করিতে পারিলনা।] 'ধর্ম্মসার' নাম সার্থক হইয়াছে, তদানিন্তন ভিক্ষুগণ ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া অন্ততঃ প্রকৃত পুরোহিত ভিক্ষু হইতে ও গৃহীগণ ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পণ্ডিত ধর্ম্মরাজের প্রণীত কয়েকখানি পুস্তকও সমাজে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রচার করিতে সহায়তা করিয়াছে। ডাক্তার রামচন্দ্র মুৎসুদ্দী ব্রহ্মযুদ্ধের পর সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে পালি ও সমাধি শিক্ষায় প্রবৃত্ত রহিলেন এবং জটিল অভিধর্ম্মসংগ্রহ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া সমাজে মনোবিজ্ঞান ও বৌদ্ধদর্শন শিক্ষার সুযোগ দান করিলেন। তিনি দেশে আসিয়া অনেককে সমাধিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তাঁহার উৎসাহে বিপ্রদাশ মুৎসুদ্দী মহামুনি পাহাড়ে সমাধিমন্দির স্থাপন করিয়া দেশবাসীকে সমাধি শিক্ষার সুযোগ দান করেন। উভয়ের তিরোধানের পর সমাধিব্রতও বেন

অন্তর্দ্ধান করিল। অমরকীর্ত্তি চন্দ্রমোহন মহাস্থবির লঙ্কা হইতে ধর্ম্ম-শাস্ত্র শিক্ষা পূর্ব্বক দেশে আসিয়া অন্ধকার সমাজে আলো বিস্তার করেন, সমাজের সংস্কারে ও ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সর্ব্ব-প্রথমে পাহাড়তলী গ্রামে পালিটোল স্থাপন করেন। তিনি ও অগ্‌গসার মহাস্থবির গোবিন্দ পণ্ডিত ওঅন্যান্য শিক্ষার্থীকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন, পরে তাঁহারা ঐ টোল সাতবাড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করেন।

আমার ছাত্রাবস্থায় (১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) সামাজিক কুপ্রথার জন্য হিন্দুরা বড়ুয়াদিগকে অস্পৃশ্যের ন্যায় ব্যবহার করিত। ক্লাশে আমরা ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিতাম। আমরা ছাত্রগণ বাগ্মীশ্রেষ্ঠ গোবিন্দপণ্ডিতের নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে যাইয়া সভাও সংকীর্ত্তন করিতাম, প্রবল বাধাসত্ত্বেও ধর্ম্ম ও সত্যের জয় হইতে লাগিল, অন্যান্য গ্রাম আমাদের আদর্শ গ্রহণ করিল। তখন প্রত্যেক ছাত্রই সমাজের জন্য কাজ করিত। আমরা ছাত্রগণ (বীরেন্দ্র মুচ্ছুদ্দী, সুরেন্দ্র মুচ্ছুদ্দী, স্কুল ডেঃ ইঃ কৈলাস কুকি, ইনজিনিয়র ব্রজমোহন বড়ুয়া, গোবিন্দ পণ্ডিত ও অন্যান্যসহ মহামুনি মেলায় ক্রমান্বয়ে ৫ বৎসর গিরীশ ঘোষের বুদ্ধদেবচরিত অভিনয় করিয়াছিলাম এবং শেষ বৎসর চট্টগ্রাম সহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রনপূর্ব্বক সদরঘাট থিয়েটার হলে এই অভিনয় প্রদর্শন করি। এই ভাবে ছাত্রদের মনে ধর্ম্মপ্রচারের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রামু থানায় পোলিশসবইং পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় সেই অঞ্চলে বড়ুয়াদের মধ্যে সাবেক কুপ্রথা প্রচলিত দেখিয়া ধার্ম্মিকপ্রবর সোনারাম মহাজন, কর্ণ মহাজন প্রভৃতি সমাজনেতৃবর্গকে সমবেত করিয়া ঐ কু-প্রথা আংশিক রহিত করিতে সমর্থ হই। দুইটী প্রতিদ্বন্দীদল সৃষ্ট হইল, পরিশেষে ধর্ম্ম ও সভ্যতার জয় হইল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কৃপাশরণ মহাস্থবির কলিকাতায় ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার

ও ধর্ম্মাঙ্কুর সভা স্থাপন করেন, লক্ষ্ণৌ, দার্জিলিং ও শিলং মহানগরে বিহার ও শাখাসমিতি, শিমলা ও অপর কয়েকটী কেন্দ্রে শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবিধ্বজ গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও স্বামী পূর্ণানন্দের সম্পাদকতায় জগজ্জ্যোতিঃ পত্রিকা প্রচার করিয়া সমগ্র বাঙ্গালায় ধর্ম্মের আলো বিকিরণ করিতে লাগিলেন, হিন্দু পণ্ডিতগণ তাহাতে যোগদান করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধের মধ্যে বেণী বাবু, মহিম বাবু ও রেবতী বাবু প্রথমে এম, এ, পাশ করেন বৌদ্ধজাতির পৃষ্টপোষক মহামতি সার আশুতোষ সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে সমিতি সরকার হইতে বৃত্তি লইয়া বেণী মাধব বড়ুয়াকে উচ্চ শিক্ষার্থে লণ্ডনে প্রেরণ করেন, তিনি ভারতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাহিত্যের ডক্টার (D. Lit.) উপাধি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, পরে বৌদ্ধ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক সার আশুতোষ ডক্টার বড়ুয়াকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি প্রফেসার, স্বামী পূর্ণানন্দ ও জ্ঞানীশ্রেষ্ট ভগবান মহাস্থবিরকে লেক্‌চারার নিযুক্ত করেন।

নাজির বাবু ও গুণমেজু মহাস্থবিরের পরলোকগমনের পর জেল-ডাক্তার ভগীরথ বড়ুয়া ও বৌদ্ধরত্ন হরগোবিন্দ মুচ্ছুদ্দী বৌদ্ধসমিতির যথাক্রমে সম্পাদক ও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। স্বজাতিহিতৈষী তেজস্বী ডাক্তার চট্টগ্রামে বিহার স্থাপনের জন্য জমি খরিদ করেন এবং সহ-সভাপতি ড্রয়িং মাষ্টার হরকিশোর চৌধুরী, মোক্তার সতীশ বাবু, নীরবকর্ম্মী ঈশান বাবু যুগল বাবু, কালিকিঙ্কর বাবু, হরিশ বাবু, প্রভৃতি সদস্যগণের যোগতায় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিন কামরাবিশিষ্ট একতালা বিহার নির্ম্মাণ করেন। বৌদ্ধ সমিতির কার্যকারীতায় ও কৃপাশরণ মহাস্থবিরের সহায়তায় ভাইস-চেন্সলার বিদ্যোৎসাহী বঙ্গব্যাঘ্র সার আশুতোষ সরস্বতী বঙ্গদেশের স্কুল কলেজে পালী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। সম্পাদক ভগীরথ ডাক্তারের চেষ্টায় বড়ুয়া সমাজের প্রথম গ্রেজুয়েট মহিমা রঞ্জন বড়ুয়াকে এম, এ, কে চট্টগ্রাম কলেজের

পালি প্রফেসার ও অগ্‌গ মহাপণ্ডিত ধর্ম্ম বংশ মহাস্থবিরকে অবৈতনিক লেক্‌চারার নিযুক্ত করা হয়। ডাক্তার বাবু স্বয়ং যাইয়া মহাস্থবির মহোদয়কে কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে লইয়া আসেন এবং তাঁহাকে বিহারের অধ্যক্ষ ও সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। আমার সম্পাদক থাকার সময় সভাপতি মহোদয় ও সহকারী সভাপতি হরকিশোর চৌধুরীর সহযোগে চাঁদা উঠাইয়া এবং ত্রিপুরা মহারাজের ১৫০০ টাকা সাহার্য্যে উপরতালায় তিন কামরা নির্ম্মান করা হয়, (৪০ বৎসর পরে রেবতী বাবুর নেতৃত্বে চাঁদা উঠাইয়া এবং গভর্ণমেণ্টের ২৫০০০ টাকা সাহায্যে দ্বিতল সম্পুর্ণ নির্ম্মান করা হইয়াছে।) এবং নীচে বিস্তৃত হলের কার্য্য আরম্ভ করা হয় এবং সমিতি কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বৌদ্ধবিহার নামে পুস্তিকা ছাপাইয়া চাঁদার আবেদন প্রচার করা হয়। নাজির বাবুর সুযোগ্য পুত্র পূর্ব্বতন সেক্রেটারী নগেন্দ্রলাল চৌধুরী এবং আমার কার্য্যকালে সমিতির নিয়মানুযায়ী তিন বৎসর অন্তর কমিটীর পুনর্গঠন এবং চৌধুরী মহাশয়ের কার্য্যকালে সাতবারিয়া, নানুপুর ও পাহাড়তলী গ্রামে বার্ষিক মহাসভার অনুষ্ঠান হয় এবং আমার কার্য্যকালে পাঁচরিয়া, নাইখাইন, হাসিমপুর, পড়ুয়া, হিঙ্গলা ও মায়নী দমদমা গ্রামে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যে বার্ষিক মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সমিতির কার্য্য ও নিয়মাবলী লইয়া সমিতি ও জনসাধারণের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হওয়ায় যাত্রামোহন হলে প্রায় সকল গ্রাম হইতে সহস্রাধিক বৌদ্ধনেতার গোবিন্দ পণ্ডিতের সভাপতিত্বে গৃহীত নিয়ম সমিতি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া পরে অধিকাংশ মেম্বার অস্বীকার করায় জনসাধারণের স্বার্থে জাতীয় একতা রক্ষার জন্য আমি সমিতি ত্যাগে বাধ্য হই। তৎপরে সমিতি অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। নানাস্থান হইতে নোটীশ দেওয়া সত্বেও কমিটীর পুনর্গঠন কিংবা বার্ষিক সভার অধিবেশন বন্ধ হইয়া যায়। আমরা চট্টগ্রাম সহরের

করা হয়, প্রেস জাপানী বোমে ধ্বংসসাৎ হয়, যুদ্ধের ফলে সমিতি ও মিশনের কার্য্যকারিতা বন্ধ হইয়া যায়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামসহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়া চট্টগ্রাম:বৌদ্ধ:কো:ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়, প্রথম ৫ বৎসর মাতৃমন্দিরের এক কামরা অফিসের জন্য বিনাভারায় ব্যবহার করিতে দিই। মূলধন লক্ষটাকা অতিক্রম করিলে জমিখরিদ পূর্ব্বক পাকাগৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। জাপানি যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মপ্রবাসী কর্জ্জগ্রহীতা মেম্বারগণ ও অন্যান্য সকলেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রাণটী লইয়া হাটিয়া চলিয়া আসে, এবং কর্জ্জ টাকা দিতে বিরত হয়, অন্যান্য মেম্বারগণও কর্জ্জ দেওয়া বন্ধ করে, কেরানী বোমের ভয়ে চলিয়া যায়। ডাইরেক্টার গণ (আমি ও সেক্রেটারী ব্যতীত সকলেই কর্জ্জগ্রহীতা) সহযোগীতা করিতে বিরত হইলেন, সভার দিনে সেক্রেটারীকে ডাকাইয়া প্রত্যেক স্থগিত সভায় প্রায় ৫ বৎসর একাই চেয়ারম্যান ও কেরাণীর কাজ করিয়া বেঙ্কের কার্য্য পরিচালন করি। বার্ষিক সভায় ৫ | ৭ জনের বেশী উপস্থিত থাকেন না, আমি যথাসম্ভব টাকা আদায় করিয়া আমানতকারীদিগকে হারাহারী দিতে থাকি, কিন্তু কয়েকজন আমানতকারী ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়া বেঙ্কের গৃহ ক্রোক করেন, সেই টাকাও আদায় করি। অন্যান্য কয়েক জন ডিপজিটর তদ্রূপ মোকদ্দমা করিতে উদ্যত হইলে তাহাদের আংশিক টাকা দেওয়া হয়। এঃ রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তখনকার রুল মতে বেঙ্ককে লিকুইডিশনে দিয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে টাকা আদায়পূর্ব্বক পুনরায় বেঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে সাব্যস্থ করিয়া তৎমতে আবেদন করিলে কর্জ্জগ্রহীতা মেম্বারগণ ভয়ে এই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নবাগত রেজিষ্ট্রারকে ভ্রমে পাতিত করিয়া এক গ্রামে বার্ষিক সভা আহ্বান পূর্ব্বক আমার অনুপস্থিতিতে যেন তেন প্রকারেন

নূতন কমিটী গঠন করেন প্রায় ১২ বৎসর হইয়াছে। কিন্তু বেঙ্কের কার্য্যকারিতা কি কোন সভা আহ্বান করা সম্বন্ধে অন্য ডিপজীটর গণ কি আমি * অবগত হইতে পারিলাম না. সরকার হইতে আমার রিপোর্টের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই।

দক্ষিণ কুলের সঙ্ঘনায়ক রামধন মহাস্থবিরের মৃতদেহ সৎকার উপলক্ষে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রামধন স্মৃতিকমিটির সেক্রেটারী থাকিয়া প্রায় তিন সহস্র টাকা চাঁদা সংগ্রহ করি। সকল নিকায়ের ভিক্ষু ও দায়কগণের উপস্থিতিতে মৃতের সৎকার, শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি করিয়া অবশিষ্ট ১৫০০ টাকা শতকড়া বার্ষিক দশ টাকা হার সুদে বৌদ্ধ বেঙ্কে আমানত রাখি। তিন নিকায়ের ১৫ জন ভিক্ষুর কমিটি দশবৎসর অন্তে ক্রমে ক্রমে সকল নিকায়ের ভিক্ষু বা শ্রমণকে সিংহল বা ব্রহ্মদেশে উচ্চপালি শিক্ষার্থ বৃত্তি দেওয়ার নিয়মাদি লিপিবদ্ধ করি, (রামধন স্মৃতি ভাণ্ডার দ্রষ্টব্য।) উক্তকমিটি তিন নিকায়ের তিন জন ভিক্ষুকে ক্রমান্বয়ে বৃত্তি দিয়াছিলেন। তৎপরে ব্যাঙ্ক উক্তরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়ায় বৃত্তি দেওয়া বন্ধ রহিয়াছে।

নিদ্রিত বৌদ্ধ সমাজকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে অগ্‌গসারজয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামবৌদ্ধমহাসভায় ব্যবস্থা করা হয়। ডক্টার অরবিন্দ বড়ুয়াকে সমাজ শাখায়, জ্ঞানীপ্রবর হিন্দুস্থানী ভিক্ষু আনন্দকৌশল্যায়ন বি. এ, কে ধর্ম্মশাখার, প্রফেসর সুরেন্দ্র নাথ বড়ুয়াকে সাহিত্যশাখার এবং ধ্যানী প্রবর ভগবান মহাস্থবিরকে জয়ন্তী মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়, মাষ্টার পুলিন

*ভিন্ন ভিন্ন নামে আমার প্রায় ৫০০্টাকা আমানত এখনও আছে। আমি একাই সহস্র সহস্র টাকা উসুল করিয়া ডিক্রিজারীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ডিপজিটর গণকে হারাহারি টাকা দিয়াছি, আমি ইচ্ছা করিলে আমার সম্পূর্ণ টাকা আদায় লইতে পারিতাম, কৃতজ্ঞতার মূল্য আছে কি?

বিহারী বড়ুয়াকে (৫০০) স্বেচ্ছাসেবকের জেনারেল অফিসার কমেণ্ডিং নিযুক্ত করা হয়। মহাস্থবির সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের পরিবাস, ডক্টার ওয়াডেল সাহেবের অজন্তার ধ্বংসস্তুপে আবিস্কৃত ধর্ম্মচক্রের (সংসারচক্রের) কেন্দ্রে রাগদ্বেষমোহের (অবিদ্যার) রূপক প্রতিকৃতি কপোত সর্প ও শুকরের মূর্ত্তি, চক্রে নেমির গায়ে দ্বাদশ-নিদানের দ্বাদশটি রূপক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যাখ্যা প্রচার, বুদ্ধচক্র, পরলোকগত ৬২ জন বৌদ্ধ মহাত্মার স্মৃতিঅর্ঘ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। অষ্টসহস্রাধিক বৌদ্ধ জনগণের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ ও অপূর্ব্ব জাগরণের মধ্যে ভগীরথ নগরে মহাসভার অধিবেশন ও জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করা হয়। ভারত, ব্রহ্ম, সিংহলে ইংরেজী ও বাঙ্গলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রায় ২০০০ বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদপত্রে প্রচারের ফলে বিখ্যাত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হইতে শতাধিক অভিনন্দন পত্রের মধ্যে রেঙ্গুনের সঙ্ঘনায়ক অগ্‌গমহাপণ্ডিত ইউ, জটিলা মহাস্থবির, সিংহলের বিদ্যালঙ্কার কলেজ ও অরিয়েণ্টেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ভারতীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারী, বম্বে ও উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী, বিশ্ববিখ্যাত ডক্টার গৌর, মহাবোধির সভাপতি হাইকোর্টের প্রধান জজ মহামতি সার মন্মথনাথ মুখার্জির পত্র, মূল সভাপতিগণের অভিভাষণ, ডক্টার বড়ুয়ার প্রেরিত অভিভাষণ, আমার অভিভাষণ, ধর্ম্মশাখা ও সাহিত্যশাখার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী ও B Dh অনন্ত কুমার বড়ুয়ার অভিভাষণ, হোয়ারাপাড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের পক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী উকিল রোহিনীরঞ্জন বড়ুয়ার অভিভাষণ, মহাসভায় গৃহীত ২০টি প্রস্তাব, প্রস্তাবের উত্তরে গভর্ণমেণ্টের পত্রাদি, যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয়, হিসাব পত্রাদি সহ আমি মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও জয়ন্তী সভার সম্পাদক রূপে কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করি।

একটী প্রস্তাবের ফলে Ex M. L C. ডক্টার অরবিন্দ বড়ুয়ার যোগে বৌদ্ধশিক্ষার (পালিটোলের) জন্য এই সর্ব্ব প্রথমে গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন. পাকিস্তান সরকার এ বৎসর ৫০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন,) স্থানীয় পাঞ্চজন্য পত্রিকা ২১।৩।৩৮ ইং তারিখে নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রচার করেন—

"বহুবর্ষের সুপ্তির পর চট্টগ্রামের নানাস্থানের বৌদ্ধগণ সমবেত হইয়া যে তাঁহাদের নূতন চেতনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে দেশের শিক্ষার অনেক কিছু আছে. সেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দাবী বাড়িতেই থাকে, কিন্তু বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গণ্ডী ক্ষুদ্র বলিয়া হউক বা অন্য কারণে হউক তাহারা এতদিন নিশ্চেষ্টই ছিল, আজ তাহাদের এই নূতন জাগরণকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি"।

ইহার কিছুকাল পরেই ১৪ বৎসর অন্তে ১৯৩৮ সনের শেষ ভাগে সাতবাড়িয়া বৌদ্ধ মহাসভায় চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির পুনর্গঠন করা হয়। তাই অনাবশ্যক বোধে বৌদ্ধ সমাগমের কার্য্যকারিতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রভাতসূর্য্যসদৃশ স্কুল ডেঃ ইং মহামতি গগনচন্দ্র বড়ুয়া চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক সবরেজিষ্ট্রার অধরলাল বড়ুয়া, মাষ্টার মোহন চন্দ্র বড়ুয়া প্রভৃতির সহযোগে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মহামুনি উচ্চইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে প্রধানতঃ বৌদ্ধগণের দ্বারা রাঙ্গুনীয়া, আর্য্যমিত্র, রামু, আমতাভ, কর্ত্তালাবেলখাইন উচ্চইংরেজী স্কুল স্থাপিত ও জনসাধারণের শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে। চট্টগ্রামের স্বল্পসংখ্যক বৌদ্ধগণের দ্বারা ৬টি উচ্চ ইংরেজীস্কুল স্থাপন সামান্য গৌরব ও প্রশংসার বিষয় নহে। পূর্ব্বে কেহ এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পাশ করিলে সমগ্র সমাজে আনন্দের রোল পড়িত, বৌদ্ধের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের হার সংখ্যানুপাতে বেশী, শুধু

পাহাড়তলী-গ্রাম হইতেও এই বৎসর ৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এম, এ, পাশ করিয়াছে। তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধন জনসাধারণের উপকারে আসিলেই তাহাদের জীবন স্বার্থক হইবে।

মধ্যযুগে বড়ুয়াদের মধ্যে ডক্টার বড়ুয়া প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম, অশোকের শিলালিপি, প্রাকৃত ধর্ম্মেরপদের অনুবাদ প্রভৃতি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ, মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক, গুণালঙ্কার, ধর্ম্মরত্ন ধর্ম্মাধার, বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী পুন্নানন্দ, ত্রিপিটকাচার্য্য বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছুদ্দী, * কিরণ বিকাশ মুচ্ছুদ্দী আরো অনেকে ধর্ম্মগ্রন্থাদি, গিরীশ পণ্ডিত স্কুল পাঠ্য পাঠশালাপদ্ধতি, শিক্ষক লোকেন্দ্র লাল বড়ুয়া পালি ব্যাকরণ ও পাঠমালা প্রভৃতি, প্রফেসার নীরদরঞ্জন বড়ুয়া পালি ব্যাকরণ, মাষ্টার মোহনচন্দ্র বড়ুয়া বুদ্ধকীর্ত্তন প্রণয়ণ করিয়াছেন। মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট হইতে, মহাস্থবির ধর্ম্মবংশ বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট হইতে ও অগ্‌গমহাপণ্ডিত উপাধি, বেণীমাধব বড়ুয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাহিত্যের ডক্টার ব্যারিষ্টার অরবিন্দ বড়ুয়া

* শ্রেষ্ঠসাহিত্যিক বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছুদ্দী অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহের অনুবাদ, প্রতীত্য সমুৎপাদ, ধর্ম্মপদের অনুবাদ, ও উপোসথ সহচর গ্রন্থ লিখিয়া " ধর্ম্মে বিজয়তাং চট্টলে ধর্ম্ম মণ্ডলী" হইতে ত্রিপিটকাচার্য্য উপাধি পাইয়াছিলেন। মাতৃদেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ মাতৃপূজায় মানবধর্ম্ম লিখিয়া বঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র, চট্টলে ধর্ম্মমণ্ডলী এবং ডক্টার বড়ুয়া ও নেপালের ধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্য্য প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত All India Buddhist Couqrress কমিটি হইতে ৪ টি উপাধি পাইয়াছি। পৃথিবীর অনেক বৌদ্ধধর্ম্মবিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রশংসিত Buddihism 's Contribution to Word culture & civilization নামে বই লিখিয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রায় সমুদয় দেশের রাজা বা প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রী, বিখ্যাত ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতিতে দান করিয়াছি, ইহার বাংলা অনুবাদ যন্ত্রস্থ।

ও ভিক্ষু এক্ষণে বড়ুয়া জিনানন্দ দর্শনের ডক্টার, ইন্দুভূষণ বড়ুয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ও প্রমোদরঞ্জন বড়ুয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষার ডিপ্লোমা, অরুণ চন্দ্র বড়ুয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, ফিল, ললিত কুমার বড়ুয়া রায় সাহেব. ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন, ডক্টার অরবিন্দ বড়ুয়া বাঙ্গালার M. L. C. মাষ্টার সুধাংশুবিমল বড়ুয়া পাকিস্তানী বৌদ্ধদের পক্ষে M. L. A. মনোনীত ও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত বড়ুয়াদের মধ্যে অনেক উকিল, মোক্তার, উচ্চইংরেজী স্কুলের হেডমাষ্টার, মুন্সেফ, সবজজ ম্যাজিষ্ট্রেট, সিভিল ও এসিষ্টেন্ট সার্জ্জন, ইনকামটেক্স অফিসার, ইনজিনিয়র, প্রফেসার প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারীর সংখ্যা নগণ্য নহে এবং বহুসংখ্যক বি, এ, এম, এ, এম, কম, প্রভৃতি রহিয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ে বিশেষ অগ্রগতি দৃষ্ট হয় না, উকীলেরাও প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে পরাজিত হইতেছেন। বৌদ্ধদের জনসংখ্যা অল্প হইলেও মনে রাখিবেন একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি নচতারা গণৈরপি। বর্ত্তমান যুগের যুবকগণের অজ্ঞাত বহু-তত্ত্বসম্বলিত বড়ুয়াজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া গেলাম, বর্ণিত উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া আরো তত্ত্বসংগ্রহ পূর্ব্বক কোন জাতি হিতৈষী যোগ্যতর ব্যক্তি জাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলন করিতে পারিবেন। বড়ুয়াজাতির ক্রমোন্নতির সহিত আমার জীবনের অনেক ঘটনা বিজড়িত তাহা এস্থলে অপরিহার্য্য ও অবর্জ্জনীয়, ইহা প্রগল্ভতা নহে, ইহা মার্জ্জনীয়। পরিশেষে জাতির কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয় লিখিয়া পুস্তিকার উপসংহার করিব।

জাতীয় উন্নতির প্রস্তাব সমূহ।

দরিদ্র বড়ুয়াজাতির বিবাহ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, বিশেষতঃ পণপ্রথা প্রবর্ত্তনহেতু গ্রামে গ্রামে বহু সংখ্যক যুবক যুবতীর বিবাহ হইতেছে না, ফলে প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রায় ১২ জন বয়স্কা যুবতী

স্বেচ্ছায় বা প্রলোভনের ফলে ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। ভাণ্ডারগাও গ্রামে চট্টগ্রামের প্রায় গ্রামের সমাজকর্ত্তৃপক্ষগণকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আমার সভাপতিত্বে জনসভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—

১। পাত্রীকে বরের বাড়ীতে আনিয়া বিবাহ করকে শাস্ত্রে রাক্ষসী বিবাহ বলা হয়। শাস্ত্রমতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান পাত্রীর বাড়ীতে যাইয়া বিবাহ করেন, ইহাতে বিবাহের খরচ অনেক কম হইবে, তদ্ধেতু প্রস্তাব গৃহীত হইল যে বর পাত্রীর পিতার বাড়ী যাইয়া বিবাহ করিবেন। তাহাতে পাল্কীর আবশ্যকতা থাকিবে না, ঢোল বাদ্য পক্ষগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, তবে ঢোল বাদ্য রহিত করিতে সভা অনুমোদন করিতেছেন।

২। পাত্রীপক্ষের অবস্থা খারাপ হইলে পাত্রপক্ষ অর্থসাহায্য করিবেন। তাহাতেও পাত্রপক্ষের অনেক খরচ কমিবে।

৩। কোনপক্ষ পণ দাবী করিতে পারিবেনা।

৪। অন্য সমাজ হইতে বিবাহ করা ও অন্য সমাজে মেয়ে বিবাহ দেওয়া জাতির ক্ষতি বলিয়া তাহা নিষিদ্ধ করা হইল।

উক্ত প্রস্তাবাদি ছাপাইয়া সর্ব্বত্র বিলি করা হইয়াছে। জাতিহিতৈষী ব্যক্তিগণ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন।

লেখককে সভাপতি ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বড়ুয়াকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া সভায় নারীরক্ষাকমিটী গঠিত হইয়াছে। তদ্রূপ কোন ঘটনা ঘটিলে দুয়ের এককে জানাইলে প্রতিকার করা হইবে।

সমাগমের অফিস গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমি নিজ টাকায় লালদীঘির পশ্চিম পুরাতন গির্জ্জাস্থলে এক খণ্ড জমি খরিদ করিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে নাই। চট্টগ্রামে বড়ুয়া অফিসার ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার এবং সকলে একত্রিত হইয়া জাতীয় উন্নতির বিষয়ক আলোচনা ও জ্ঞানার্জ্জনের কোন সুযোগ না থাকায় জাতির প্রধান সম্পদ লাইব্রেরী

স্থাপন করার উদ্দেশ্যে অবসর প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ শ্রীরেবতী রমন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে সহরে এক বৌদ্ধ জনসভা আহ্বান করি এবং ঐ স্থানে পাকাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ভাবাদারদের উচ্ছেদপূর্ব্বক দুই বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধসমাগম লাইব্রেরী স্থাপন করিতে যে বা যাহারা সম্মত হইবেন বড়ুয়া জাতির পক্ষে তাহাকেই এই জমি দান করিব বলিলে মাত্র পূঃ পঃ বৌদ্ধকৃষ্টিপ্রচারসঙ্ঘের পক্ষে সভাপতি ও সম্পাদক আমার সর্ত্তে সম্মত হইলে তদ্রূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়, তদনুযায়ী ১৯ | ১১ | ৫৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী দানপত্র সম্পাদিত হইয়াছে। লিখিত নিয়মানুযায়ী সঙ্ঘ বৌদ্ধপ্রধানগণের সভায় রেবতী বাবুকে সভাপতি এবং প্রেস্কার হেমাঙ্গ বাবুকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া লাইব্রেরী গৃহনির্ম্মাণসমিতি গঠিত করিয়াছেন। ভারাদারদের বিরুদ্ধে House rent Control আইন মতে বর্ত্তমান গৃহ খাস করার অনুমতির মোকদ্দমা দায়ের আছে। দানপত্রের সর্ত্তমতে সমগ্র বড়ুয়া জাতি লাইব্রেরীর মালিক হইবেন এবং গৃহ নির্ম্মান করা হইলে বৌদ্ধ জনসভায় পরিচালন কমিটি গঠন করিবেন, ইহা সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্য খোলা থাকিবে। বৌদ্ধবন্ধু, বৌদ্ধপত্রিকা, মৈত্রী প্রভৃতি জাতীয় পত্রিকা মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়া একিবারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক থাকিলেও লেখক, পাঠক, জাতীয় প্রেস ও ফণ্ডের অভাবই ইহার প্রধান কারণ, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য অর্থব্যয় যে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় অধিকাংশ পাশ করা ব্যক্তি তাহা অবগত নহেন। রাস্তাসংলগ্ন ২৪ হাত জায়গায় পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নীচের তালা ভারা দিলে মাসিক ২৫০ | ৩০০ টাকা আয় হইবে, উপরতালায় লাইব্রেরী ও মিটিংহল ইত্যাদি থাকিবে, এই আয় হইতে পত্রিকা চালান সহজ হইবে, তিন তালা করিলে বেঙ্কের কার্য্য পরিচালন এবং প্রেস প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারিবে। ইহাই আমার উদ্দেশ্য, তাহাতে এই সর্ব্বসাধারণ লাইব্রেরীর

গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য মুক্ত হস্তে দান করার জন্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে অনুরোধ জানাইতেছি। বৌদ্ধমাত্রই লাইব্রেরী স্থাপনের কার্য্য রীতিমত হইতেছে কিনা দেখিতে যত্নবান।

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রারম্ভে দলে দলে হিন্দুগণ এদেশ ত্যাগ করায় বড়ুয়াগণও স্বভাবতঃ চঞ্চল হইয়া পড়েন। কিংকর্ত্তব্য নির্ধারণের জন্য আমার আহ্বানে সকল গ্রামের প্রায় সমুদয় শিক্ষিত ও প্রধান প্রধান লোকের উপস্থিতিতে প্রথম পূঃ পাঃ বৌদ্ধমহাসভায় রাজভক্তির এবং জাতীয় দাবী সমূহের প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রস্তাব কার্য্য পরিণত করার জন্য রেবতী বাবুকে সভাপতি, আমাকে সম্পাদক ও সুধীর বাবুকে সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। প্রস্তাব সমূহের উত্তরে গভর্ণমেণ্টপক্ষে জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কমিটীর সম্পাদকরূপে আমাকে ১০|৭|৪৭ ইং তারিখের ২০২৯|সি, পত্রে বৌদ্ধজাতির ধর্ম্ম ও যাবতীয় প্রথাদি রক্ষা এবং বৌদ্ধ জাতিকে সদয় ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেন এবং পত্রখানির বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধ মতে বৌদ্ধগ্রামসমূহে বিতরণ করিয়াছি। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পত্র ও সাক্ষাতে জাতির অভাব অভিযোগ জানান হয় এবং স্বাধীনতা দিবসে বৌদ্ধজাতির পক্ষে মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতীক সপ্তবর্ণ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ সুশোভিত, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক নীলাকাশে তারকাবিনিন্দিত সকল জাতির পবিত্র অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত এবং পাকিস্তানী পঞ্চজাতির প্রতীক পঞ্চশিখাবিশিষ্ট তারকাচিহ্নিত রাজকীয় পতাকা অভিবাদন করিতে যাইয়া এই পতাকার সম্মান রক্ষার্থ আমরা প্রাণপাত করিতে পশ্চাৎপদ হইবনা বলিয়া সেই অগণিত মনুষ্য সমুদ্রের মধ্যে ঘোষণা করি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমরা যে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়াছি তাহা ষ্টাণ্ডিং কমিটির কার্যকারিতার ফল, বস্তুতঃ এযাবৎ সরকার আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। আমরাও সিংহল, ও নেপালে বিশ্ব বৌদ্ধসম্মিলনে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের বিষয় বক্তৃতায়

এবং World Buddhism পত্রিকায় আমার প্রবন্ধে বিশ্ববৌদ্ধের নিকট ও সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছি। জাপান বিশ্ববৌদ্ধসম্মিলনে আমার প্রেরিত বক্তৃতার উপর নির্ভর করিয়া সভাপতি ডক্টার মালালশেখর অভিভাষণে পাকিস্তান সরকারকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। আবশ্যকবোধে সরকারের নিকট ঐ প্রতিশ্রুতির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দেশ বিভাগের ফলে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও ধনীব্যক্তি চাকরি ও ব্যবসায় উপলক্ষে হিন্দুস্থানের নানাস্থানে থাকায় যাতায়াত ও টাকা আদান প্রদানের সুযোগ না থাকায় বাধ্য হইয়া সেই দেশের সিটিজেন্‌সিপ লইয়াছেন, বিশেষতঃ জাপানযুদ্ধ ও ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সেই দেশ হইতে শত শত ব্যবসায়ী নিঃস্ব হইয়া ও চাকরিজীবি বাধ্য হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং বড়ুয়া জাতি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এই যুগসন্ধিক্ষণে বাঁচিতে হইলে ও জাতিকে বাঁচাইতে হইলে চাই বিদ্যা, ধন ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি, সর্ব্বোপরি জাতীয় একতা। আয়াসপ্রিয় জাতিকে পরিশ্রমের মূল্য ও মর্যাদা বুঝিতে হইবে, নূতনসৃষ্ট স্বাধীন দেশে শিল্পে ও ব্যবসায়ে উন্নতি করার বহুসুযোগ ঘটিয়াছে, প্রতিযোগীতার ভাব লইয়া সাহসের সহিত সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। এই সমুদয় বিষয়ে জাতির মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে কয়েকবার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছি। ধর্ম্মবল বা চরিত্রবল না থাকিলে মানুষ কখনও সুখী হইতে পারেনা। ধর্ম্ম ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোমলমতি বালকবালিকাদের পূর্ব্বের মত ক্যাংশিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাই বিজ্ঞপ্তি ছাপাইয়া প্রায় সকল গ্রামে বিতরণ করিয়াছি. যে কয়েকখানি বিহারে তাহা করা হইয়াছে ভিক্ষুগণ সেখানে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছেন বলিয়া আমাকে জানাইয়াছেন। বহুসংখ্যক পালিটোল সরকার হইতে সাহায্য পাইতেছেন, সেই সমুদয় বিহারে এই ভাবে

ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তন না করিলে সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। জাতীয় একতার জন্য ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আমার জীবনের সাধনা ১৯৫৮ সনে আদালতের রায়ের দ্বারা সিদ্ধ হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিখণ্ডিত সমাজকে একতাবদ্ধ করার জন্য যাত্রামোহন হলে গোবিন্দ পণ্ডিতের সভাপতিত্বে প্রায় সকল গ্রামের সহস্রাধিক বৌদ্ধনেতার জনসভায় গৃহীত নিয়মাবলী বৌদ্ধসমিতির অধিকাংশ সদস্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাতবারিয়া মহাসভা কমিটীকে ১৪ বৎসর পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত করিলে পর বৎসর সভাপতি অগ্‌গমহাপণ্ডিত ধর্ম্মবংশ মহাস্থবির সাতবারিয়া গ্রামে হঠাৎ পরলোকগমণ করিলে তৃতীয় দিন শবদেহ বাক্সে বন্ধ করার সময় সমিতির কোন সভা আহ্বান না করিয়া বৌদ্ধসমিতির বিশেষ সাধারণ সভা নাম দিয়া সেক্রেটারী ও অন্যান্য মেম্বরের অসাক্ষাতে ও অজ্ঞাতে মাত্র ২।৩ জন মেম্বর স্বার্থের বশীভূত হইয়া সেই শোকসভায় উপস্থিত জনগণকে ভ্রম পাতিত করিয়া সমিতির সভাপতি নিযুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘভেদের সমান অপরাধ সমাজভেদ করায় প্রতিকারের জন্য উকিল অন্নদা-চরণ বড়ুয়া প্রভৃতির কার্য্যাদি আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল। আদালতে বেআইনী ঘোষিত সভাপতি পরে কমিটীর অপর মেম্বর-সহ ঠিক আমার মতানুসারে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির নাম পাকিস্তান সমিতি হইবে এবং চিরস্থায়ী সভাপতির পরিবর্ত্তে ভোটে সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন এই দুই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সেই সভাপতি মহাশয় স্বয়ং উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য জেনারেল মিটিং আহ্বান করিলে সভার দিনে এবং স্থগিত সভার দিনেও তিনি অনুপস্থিত থাকায় সমুদয় মেম্বর এক বাক্যে প্রস্তাব দুইটী অনুমোদন ও গ্রহণ করিলেন, অপর পক্ষে সেই সভাপতি মহাশয় কোন গ্রামে বসিয়া কয়েকজন লোককে বশীভূত করিয়া চট্টগ্রাম

বৌদ্ধসমিতির পুনর্গঠন করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আপীল আদালতে জেনারেল মিটিং এর কার্য্যাদি আইনসঙ্গত ও চট্টগ্রাম বৌদ্ধ-সমিতির অস্তিত্ব নাই বলিয়া রায় প্রচার করায় এক্ষণে পাকিস্তান বৌদ্ধসমিতি যোগ্য, উৎসাহী ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের লইয়া কমিটীর পুনর্গঠনপূর্ব্বক সকলের একত্রিতশক্তিতে জাতির উন্নতির জন্য একটী ফণ্ডগঠন ও অন্যান্য উন্নতিজনক কার্য্য করিবার যে সুযোগ পাইয়াছেন আশা করি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হইবে। সমাজের আর একটী গ্রহ—ভিক্ষুনিকায়ের মধ্যে অনৈক্য।পূর্ব্বে সকল নিকায়ের ভিক্ষু-দের লইয়া এক সঙ্ঘসমিতি ছিল, পাহাড়তলী গ্রামে প্রত্যেক বৎসর প্রবারণা উপলক্ষে একই তারিখ সকল নিকায়ের ভিক্ষুগণের নিমন্ত্রন করা হইত এবং রাত্রে ভিক্ষুসমিতির অধিবেশন হইত। উভয় নিকায়ের ভিক্ষুগণ সঙ্ঘনায়ক লালমোহন মহাস্থবিরের জীবন কালে মহামুনি মন্দিরের উভয় পার্শ্বে পৃথকভাবে পরিবাস করিলেও প্রত্যহ একত্রে ধর্ম্মদেশনা করিতেন। নয়াপাড়ায় ধনঞ্জয় বৈদ্যদের অনুষ্ঠিত মহাস্থবির সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের পরিবাস সেই স্বনামধন্য আরাকানিজ ভিক্ষু গুণমেজু মহাস্থবীর পরিচালন করেন এবং ধর্ম্মসংস্কারক আচারিয়া মহোদয় ও জ্ঞানীপ্রবর রাজগুরু ভগবান মহাস্থবির তাহা পরিদর্শন করেন, আমার পত্রের উত্তরে রাজগুরু মহোদয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন, (আবোলতাবোলে আমার মন্তব্য দ্রষ্টব্য।) সেখানে ধর্ম্মসভায় রাজদূত শরচ্চন্দ্রদাশ বক্তৃতা করেন, আচারিয়া মহোদয় সভাপতি ছিলেন। অন্যান্য ছাত্রসহ আমিও রাজদূতকে দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ও অঙ্গিরী মহাস্থবিরের দাহক্রিয়া, কৃপাসরণ মহাস্থবিরের শ্রাদ্ধক্রিয়া এবং প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের জয়ন্তী উৎসবে মহাস্থবির নিকায়ের অগ্গসার মহাস্থবির এবং ধর্ম্মজ্যোতিঃ মহাস্থবিরকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল এবং ধর্ম্মসভায় তাঁহাদের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সমাজ-

হিতৈষী প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির দুইটী ধর্ম্মসভায় উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের মিলন অর্থাৎ একই বুদ্ধনিকায় করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন, ফলে আবোলতাবোল নামক পুস্তিকায় ঈঙ্গিত করা হয় যে মহাস্থবির সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ মহাযানী এবং অনুপসম্পন্ন ভিক্ষু অর্থাৎ বিশবৎসর বয়স পূর্ণ না হইতে উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই উভয় উক্তির কোনটাই যে সত্য নহে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে অগ্‌গ মহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির প্রণীত সদ্ধর্ম্ম রত্নাকর গ্রন্থের ৩০৯ হইতে ৩১৪ পৃষ্টায় লিখিত বিষয় ইহার অকাট্য প্রমাণ সঙ্ঘরাজ চট্টগ্রামে আসিবার শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রজ্যোতিঃ ভিক্ষু হীনযানী (স্থবিরবাদী) ব্রহ্মদেশে ২০ বৎসর ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এদেশে হীনযানী ধর্মপ্রচার করেন, ত্রিপুরায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসীমায় শতাধিক লোক উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকের ৩০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "কুঞ্জধামাই মহামুনিমন্দিরের এক তৃতীয়াংশ মাইল পূর্ব্বে পাহাড়ে এক ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠীত করেন, তৎপূর্ব্বে চট্টগ্রামে কোন ভিক্ষুসীমা ছিলনা, সীমার অভাবে কোন নদীর মধ্যস্থ দ্বীপে বা নদীতে নৌকা রক্ষা করিয়া তদুপরি উপসম্পদার কার্য্য সম্পাদন করিতেন"। ইহাই হীনযানী বৌদ্ধদের বিনয়সম্মত নিয়ম। সঙ্ঘরাজ আসিবার প্রায় ৫০ বসর পূর্ব্বে এই সীমা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, (আমিও এই সীমায় উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছিলাম।) আমি যে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম আরকানরাজের ২০০ বৎসরাধিক চট্টগ্রাম শাসন করিবার সময় চট্টগ্রামের মহাযানী ভিক্ষুগণ হীনযানী আরকানিজ ভিক্ষুদের সংস্পর্শে আসিয়া হীনযান মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইল। মানিক্য মহাস্থবির, তিতন, রামদাশ ও রাধাচরণ মহাস্থবির এবং গুণমেজু মহাস্থবির যে ব্রহ্মদেশের ভিক্ষু আনাইয়া কালিন্দীরাণীর ধর্ম্মযজ্ঞে স্থলকুল ভিক্ষুসীমা স্থাপন করিয়াছিলেন রাজগুরু মহোদয় ইহাও স্বীকার করিয়াছেন,

(মন্তব্য দেখুন।) নয়াপাড়া ভিক্ষু পরিবাস উক্ত গুণমেজু মহাস্থবির পরিচালন করিয়াছেন, এই দুই ঘটনায় পরিদৃষ্ট হয় মহাস্থবির সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ আরাকানিজ ভিক্ষুদের সহিত পরবর্ত্তীকালেও একনিকায়ভুক্ত হইয়া ধর্ম্মকার্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন। সঙ্ঘরাজ এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম সঙ্ঘনায়ক লালমোহন মহাস্থবিরকে ভিক্ষুত্বে দীক্ষা দেন, (চট্টগ্রাম বৌদ্ধসমিতির পাহাড়তলী গ্রামে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি উক্ত লাল মোহন মহাস্থবিরের অভিভাষণ দ্রষ্টব্য।) উপসম্পদা দিতে ৫ জন ভিক্ষুর আবশ্যক, সঙ্ঘরাজ মহোদয় এদেশীয় অপর চারিজন ভিক্ষুর সহযোগেই তাঁহাকে উপসম্পদা দিয়াছিলেন, তখন এদেশীয় ৪ জন ভিক্ষু মহাযানী বা অনুপসম্পন্ন ভিক্ষু হইলে সঙ্ঘরাজ মহোদয় তাঁহাদের সহযোগে এই বিনয়কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন না, সুতরাং আবোল-তাবোলের উক্তি নিঃসন্দেহে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। ঐ পুস্তকপ্রকাশকও লিখিত বিষয় ভুলস্বীকারে নোটীশ প্রচার করিয়াছেন। বাস্তবিক ধর্ম্মাঙ্কুরবিহারপ্রাঙ্গণে জম্বুদ্বীপ ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠাকালে ব্রহ্মের অগ্‌গমহাপণ্ডিত লেদীছয়েড এবং সঙ্ঘনায়ক ইউ জটিলা মহাস্থবির ও আকিয়াবের সুইজাদি বিহারাধ্যক্ষ তেজারাম মহাস্থবির প্রভৃতি চট্টগ্রামের উভয় নিকায়ের ভিক্ষুপ্রধানগণের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের এক নিকায় ভুক্ত করিয়া দেন এবং সকল ভিক্ষু একসঙ্গে কর্ম্মবাক্য পাঠ করিয়া উক্ত ঘেইং স্থাপন করেন (১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ধর্ম্মাঙ্কুরসভা ও মহাভিক্ষু সম্মিলনের কার্য্যবিবরণী দেখুন।) তৎপরে উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষু কলিকাতায় বার বার এবং সারনাথে একত্রে বিনয় কর্ম্মাদি সম্পাদন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় কথিত আন্দোলন আরম্ভ করার পরই কার্য্যব্যপদেশে রেঙ্গুন চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনাপূর্ব্বক জ্ঞানী, তেজস্বী ও সমাজহিতৈষী ভিক্ষু

ও সমাজ কর্তৃপক্ষকে সমাজের এই ত্রুটি সংশোধন করিতে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি, এইরাহুমুক্ত সমিতি ও একদলভুক্ত বা একতাবদ্ধ ভিক্ষু সমাজকে দ্রুত উন্নতির পথে নিতে পারিবেন, একতাবদ্ধ ভিক্ষুগণ রাজশক্তি অর্জ্জন করিতে ও ধর্ম্মানুমোদিত সমাজগঠন করিতে সক্ষম হইবেন, তখন প্রত্যেক ভিক্ষু স্বীয় স্বীয় অস্তিত্ব ও গৌরব রক্ষার্থ প্রতিযোগীতা করিবেন। ত্রিপুরানোয়াখালী বৌদ্ধসমিতিকে (যাহা একবার আমার সভাপতিত্বে পুনপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল) যোগ্য ও উৎসাহী ব্যক্তিদের লইয়া পুনর্গঠনপূর্ব্বক জাতীয়উন্নতির কার্য্যে নূতনউদ্যমে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি।

সারোয়াতলীগ্রামে সমবেত মাননীয় বিনোদ মহাস্থবির প্রমুখ ৫ জন প্রাচীন ভিক্ষুর কোন শ্রমণ নাই দেখিয়া গ্রামে গ্রামে পড়িতে বা পড়াইতে ইচ্ছুক দরিদ্র বালকদের স্থানীয় চাঁদায় বা ভিক্ষুফণ্ডের অর্থে শ্রামণ্য ধর্ম্মে দীক্ষা দিবার জন্য দশজন ভিক্ষু লইয়া কমিটী গঠন করিতে সঙ্ঘরাজ ভিক্ষুমহাসভার সভাপতিকে পত্র দিয়াছিলাম। সেই বিষয় এবং ক্যাংশিক্ষা প্রবর্ত্তন, ২ | ২ জন ভিক্ষুকে মহাস্থবির সুমনাচার প্রতিষ্ঠিত সমাধিকেন্দ্রে শিক্ষার্থ প্রেরণ, পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম ও পাকিস্তানের অন্যান্য জিলায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ মিশনসমিতি গঠন করার জন্য সঙ্ঘরাজ সম্প্রদায়ের গতবৎসর পাহাড়তলী যোগেন্দ্রারামে কঠিনচীবরদান উপলক্ষে সমবেত ভিক্ষুগণকে প্রস্তাব দিয়াছিলাম, সমাজের উন্নতিকামী ভিক্ষু ও গৃহীগণের এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

সকল প্রাণী সুখী হউক, জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠিত হউক।

শ্রী উমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী।

দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বে বর্ণিত ক্যজহোয়াসাং তরফের মালিকগণ ব্যতীত তিসরীর রামমমপ্রু তরফের মালিক ভেদীরাম চৌধুরী, তালসরার

ব্রজকিশোর তরফের মালিক ২২ গ্রামের ২২টী পুকুর খননকারী ভঙচৌধুরী, কর্তালাবেলখাইনের চূড়ামন কেরাম্ব তরফের মালিক, সাতবারিয়ার শ্রীতবফের মালিক, পাহাড়তলীর জমিদার মহামুনিমন্দির পার্শ্বে বৃহৎ বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠাতা কালিচরণ মুচ্ছদ্দীও চৌধুরীদের পূর্ব্ববর্ত্তী, বীনাজুরি, ডাবুয়া, মির্জ্জাপুর, সাতবারিয়া, উনাইনপুরা, ভাণ্ডারগাও, আঁধারমাণিক, হিঙ্গলা ও অন্যান্য গ্রামের চৌধুরীদের পূর্ব্ববর্ত্তী, রাঙ্গুনী— যাব দেখানি বিহাব ও তুল্যপুরুষদাতা (পুরুষ-স্ত্রী উভয়েব ওজনের সম-পরিমাণ দানীয় বস্তুদাতা) তিতন মুচ্ছদ্দী ও কুতুবদিয়ার লাইট হাউস নির্ম্মাতা কন্টাক্টার কৃষ্টচরণ মুচ্ছদ্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী আরো অনেক বড়ুয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক তরফ ছিল, তখন হইতে জমিদারগণ বংশপরম্পরা চৌধুরী উপাধি ধারণ করিতেছেন। মুসলমান শাসনকালে অনেক বড়ুয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচাবীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁহারা ষ্টেট বা পরগণার ম্যানে-জার বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাঁহাদের উপাধি ছিল মুচ্ছদ্দী (মসহোদী)। এতদ্ব্যতীত তালুকদার ও প্রতিপত্তিশালী বড়ুয়ার সংখ্যাও অতি অল্প ছিলনা। গ্রামের পরিচালক সর্দ্দারকে শীকদার বলা হইত (হাসীমপুরের গুরণ শীকদারের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রভৃতি)। গ্রামে ২ বড়ুয়াদের নির্ম্মিত রাস্তা (রাওলির রাস্তা, পোহাং এর জাঙ্গাল প্রভৃতি,) খনিত পুকুরদিঘী আরো বহু কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বকাল হইতে চিকিৎসা ব্যবসায় বড়ুয়াদের চট্টগ্রামে একচেটিয়া ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। এখনও গ্রামে গ্রামে বড়ুয়ামগবৈদ্য-গণের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। তাহারা মগধশাস্ত্রীয় সংক্ষেপে মগাশাস্ত্রীয় চিকিৎসা করেন, বিশেষতঃ স্ত্রীরোগ ও বালরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত ফলপ্রদ বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিদিত। এক্ষণে অনেক মগবৈদ্য তাহাদের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া সহজসাধ্য হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। স্বর্গগত সরকারী উকিল রায়সতীসচন্দ্র সেন বাহাদুর তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক বিখ্যাত ধর্ম্মচরণ

বৈদ্য এই জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া উক্ত সহজসাধ্য চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ রামচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত সুয়েনাকাং নামে মগাশস্ত্রীয় চিকিৎসাপুস্তক অপ্রাপ্য হওয়ায় আমি বিখ্যাত মগবৈদ্যগণকে সমবেত করিয়া জাতীয় চিকিৎসার উন্নতিসাধন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের তালিকা হইতে সর্ব্বসম্মতিমতে মগাশাস্ত্রীয় চিকিৎসার দ্রব্যগুণসহ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কেহ ইচ্ছাকরিলে ইহা মুদ্রিত করাইতে পারিবেন।

মগধিজাতি হইতে বড়ুয়াদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাও অবশ্যম্ভাবী উত্তম প্রমাণ।

শ্রীউমেশচন্দ্র মুচ্ছুদ্দী।

সমাপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
পোঃ আঃ মহামুনি ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট এবং মিউনিসিপাল অফিসের পশ্চিমে Give & Take ষ্টোর-এ শ্রীপুণ্যব্রত মুচ্ছদ্দীর নিকট প্রাপ্তব্য।

মূল্য—।৵০ আনা মাত্র

মুদ্রাকর : মোহাম্মদ মোছলেম খান
হাবিব প্রিন্টিং প্রেস
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।